কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ষষ্ঠ অধ্যায়: বিদ‘আত ও বিভক্তি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৬. ৬. ৪. ৩. আধুনিক যুগে খারিজীগণ

(১) ইবাযী সম্প্রদায়

খারিজী ফিরকার অধিকাংশ উপদলের বিলুপ্তি ঘটেছে। বর্তমান যুগে উপসাগরীয় দেশ ওমানে এবং উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, তিউনিসিয়া, মোরিতানিয়া ও অন্যান্য দেশে ইবাযিয়্যাহ (الإباضية) নামক খারিজী সম্প্রদায়ের মানুষের বিদ্যমান। এরা আব্দুল্লাহ ইবনু ইবায (عبد الله بن إباض) নামক এক ব্যক্তির অনুসারী। মূল খারিজী বিশ্বাস এদের মধ্যে রয়েছে। তবে সময়ের আবর্তনে অনেক সংযোজন ও বিয়োজন ঘটেছে। মুল খারিজী আকীদার পাশাপাশি আল্লাহর সিফাত, আল্লাহর কালাম ইত্যাদি বিষয়ে তার মু’তাযিলীদের আকীদা পোষণ করে।

(২) আধুনিক খারিজীগণ

উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলিতে, বিশেষত মিসরে আধু&&নক ইসলামী জাগরণের প্রেক্ষাপটে কিছু নতুন ইসলামী সংগঠন প্রাচীন খারিজী সম্প্রদায়ের আকীদা গ্রহণ করেছে। গবেষকগণ এদেরকে নব্য-খারিজী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের অনেকেই খারিজীগণের উপর্যুক্ত তিনটি মূলনীতি সঠিক বলে স্পষ্টত স্বীকার করেছেন। এদের মধ্যে একটি সুপরিচিত দল মিসরের শুকরী আহমদ মুসতফা প্রতিষ্ঠিত ‘জামা‘আতুল মুসলিমীন’ বা জামা‘আতুত তাকফীর ওয়াল হিজরাহ।

শুকরী আহমদ মুসতাফা ১৯৪২ সালে আসইয়ূতে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে ১৯৬৫ সালে মিসরের আসয়ূত শহরের কৃষি বিশ্ববিদ্যলয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তাকে ‘ইখওয়ানুল মুসলিমীনের’ সদস্য হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৭ বৎসর কারাভোগের পর ১৯৭১ সালে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগার থেকে তিনি নতুন এক ‘বৈপ্লবিক’ চিন্তা ও তত্ত্ব নিয়ে বের হন।

তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ দাবি করেন যে, একমাত্র তাঁদের জিহাদী কর্মকান্ডের মাধ্যমেই দীনের বিজয় সম্ভব হবে। তারা আরো দাবি করেন যে, অত্যন্ত দ্রুতই তারা এই বিজয় অর্জনে সক্ষম হবেন। তাঁদের এসকল দাবি দাওয়া ও দ্রুত ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগ্রহ অনেক যুবককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। তারা ‘জামা‘আতুল মুসলিমীন’ নামে একটি দল গঠন করেন। এরা এক পর্যায়ে তাদের দলভুক্ত হতে আপত্তি করে এমন সকল মানুষকে কাফির-মুরতাদ হিসেবে গণ্য করে এবং এইরূপ কাফির-মুরতাদদেরকে গুপ্ত হত্যা করার জন্য দলের কর্মীদের প্রতি নির্দেশ জারি করে। বিশেষত যে সকল আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব এদের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বিভ্রান্তি বুঝাতে চেষ্টা করতেন বা তাদের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে কথা বলতেন তাদেরকে তারা গুপ্ত হত্যা করতে শুরু করে।

এদের কর্মকান্ডের ওজুহাতে মিসরীয় সরকার অগণিত আলিম ও ধার্মিক যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এছাড়া প্রচার মাধ্যমগুলি এদের কর্মকান্ডকে সাধারণভাবে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধার্মিক মানুষ ও ইসলাম প্রচারকদের

বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ১৯৭৮ সালে এদের অধিকাংশকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। বাকি অনেককে দীর্ঘ মেয়াদি সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এরপর এ দলের ব্যাহ্যিক কর্মকান্ড দেখা যায় না। তবে মাঝে মাঝে তারা তাদের অস্তিত্ব ও কর্মকান্ড দাবি করে। এছাড়া তাদের চিন্তাচেতনা পরবর্তীকালে অনেক আবেগী মুসলিমের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে।[1]

তাদের মূলনীতিগুলি মধ্যে ছিল:

(১) কুরআন বুঝার জন্য বুদ্ধি বিবেকই যথেষ্ঠ বলে দাবি করা

এদের নেতা শুকরী দাবি করেন যে, কুরআন বুঝার জন্য কোনো মানুষের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করাও কুফরী; কারণ এতে মানুষের কথাকে আল্লাহর কথার উপরে স্থান দেওয়া হয়। এই যুক্তিতে তারা কুরআনের আয়াতগুলি নিজেদের বুঝ ও আবেগ অনুসারে ব্যাখ্যা করত। সাহাবীগণ বা অন্য কারো মতের এক্ষেত্রে কোনো মূল্য আছে বলে স্বীকার করত না।

(২) সাহাবীগণসহ পূর্ববর্তী সকল মুসলিম প্রজন্মকে ঘৃণা করা

সাহাবীগণের যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল মুসলিম প্রজন্মকে তারা ইসলামচ্যুত বলে মনে করত। কারণ তারা সঠিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করে খোদাদ্রোহী তাগুতি রাষ্ট্রশক্তির সাথে আপোস করে চলেছেন। সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের আলিমদের ব্যাখ্যা বা মতামতকে তারা কোনোরূপ মূল্যায়ন করত না। হাদীস গ্রহণ করার বিষয়ে তারা নিজেদের পছন্দের উপর নির্ভর করত। তাদের মতে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি আকল ও বিবেকই ইসলামের মূল উৎস।[2]

(৩) অতীত-বর্তমান সকল আলিমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ

শুকরী ও তার অনুসারিগণ অতীত ও বর্তমান সকল যুগের সকল আলিমের প্রতি কঠিন অবজ্ঞা প্রকাশ করতেন। সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগের আলিম, ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও সমকালিন সকল আলিমকে তারা মুর্খ, স্বার্থপর, আপোসকামি, ‘তাগুত’-এর অনুসারী, ইত্যাদি বলে অভিহিত করতেন। কোনো আলিমের পুস্তক পড়তে বা কাউকে প্রশ্ন করতে তারা তাদের অনুসারীদের কঠিনভাবে নিষেধ করতেন।[3]

(৪) অনৈসলামিক শাসন ও আইন ব্যবস্থার সরকারকে কাফির বলা

খারিজীদের মতই এরা দাবি করে যে, মুসলিম দাবিদার যদি ইসলামের কোনো অনুসাশন লঙ্ঘন করে তবে সে কাফির হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তারা মূলত রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীকেই কাফির বলেন। তারা নিজেরাই ছোট ফরয ও বড় ফরয তত্ত্বের ভিত্তিতে অনেক প্রকার পাপে লিপ্ত হন, যেগুলি কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টতই পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় চাকরী করা, রাষ্টের আনুগত্য করা, তাদের দলে যোগ না দেওয়া, ‘তাদের কথিত জিহাদ সমর্থন না করা’, ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ বা ‘গণতান্ত্রিক’ কোনো দলকে সমর্থন করা ইত্যাদি ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ পাপের কারণে তারা অনেক আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কাফির ঘোষণা করে তাদের হত্যা করেছে।

(৫) ‘আনুগত্যের’ কারণে সাধারণ নাগরিকদেরকে কাফির বলা

খারিজীগণ যেমন মানুষকে সালিস করার ক্ষমতা প্রদান, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বাইতুল মালের সম্পদে শাসকের যথেচ্ছ অধিকার প্রদান ইত্যাদি ‘মানব রচিত’ আইন প্রচলনের কারণে আলী (রাঃ), মু‘আবিয়া (রাঃ) ও পরবর্তী শাসকরদেরকে কাফির বলেছে, তেমনিভাবে এরা উপনিবেশ-উত্তর মুসলিম দেশগুলির, এবং বিশেষত মিসরের

শাসকদেরকে ‘ইসলাম-বিরোধী’ আইন প্রচলনের জন্য কাফির বলে ঘোষণা করে। তারা দাবি করে যে, আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলির জালিম শাসকগণ যেহেতু ‘ইসলামী’ আইনে বিচার করেন না বা ইসলাম বিরোধী আইনে বিচার করেন, সেহেতু তারা সকলেই কাফির ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ। আর এ সকল সরকাররে আনুগত্যের কারণে দেশের সাধারণ নাগরিকদের কাফির বলা।

(৬) জামা‘আত ও বাই‘আতের তত্ত্ব প্রদান করা

তারা দাবি করে যে, শুধুমাত্র ‘জামা‘আত’ ও বাইয়াতের মাধ্যমেই একজন মুসলিমকে অমুসলিম থেকে পৃথক করা যাবে। এই দাবির পক্ষে তারা কুরআন ও হাদীসের বাইয়াত ও জামা‘আত বিষয়ক নির্দেশাবলীকে দলিল হিসেবে পেশ করে। তাদের এই দাবি মুর্খতা ও বিভ্রান্তির সংমিশ্রণ ছিল। কারণ তাদের পেশ করা দলিলের কোনোটিতেই বাইয়াত ও জামা‘আতকে ঈমানের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি। সর্বোপরি তারা এই পরিভাষাদ্বয়ের অর্থও বুঝতে পারে নি।

(৭) বড় ফরয ও ছোট ফরযের তত্ত্ব প্রদান

খারিজীগণের মত তার পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরয আইন বলে দাবি করেন। পাশাপাশি তাঁরা দাবি করেন যে, ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত করতে মুসলিমদের উপর সবচেয়ে বড় ও প্রথম ফরয হলো ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করা। এই ফরয পালন করতে যেয়ে যদি অন্যান্য ফরয ইবাদত বাদ দিতে হয় তবে তা দিতে হবে। যেমন এজন্য প্রয়োজনে সালাত বাদ দেওয়া যাবে বা সালাতের মধ্যকার ফরয কর্ম বাদ দেওয়া যাবে।

এটিও তাদের মনগড়া একটি মতামত ছিল। কোনো ফরযকে বড় বলতে হলে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। জিহাদ, দাওয়াত, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ ইত্যাদি কর্ম কুরআন ও হাদীস নির্দেশিত ফরয ইবাদত বটে, কিন্তু কুরআন ও হাদীসে কখনোই এগুলিকে সবচেয়ে বড় ফরয বলা হয় নি। বরং কুরআন-হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, এ সকল ইবাদত বড় ফরয হওয়া তো দূরের কথা ফরয আইনও নয়, বরং তা মূলত ফরয কিফায়া। কুরআনে মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, ওযর ছাড়াও যারা জিহাদ না করে বসে থাকেন তবে তাদের মর্যাদা কিছু কমলেও কোনো পাপ হবে না। হাদীস শরীফে পিতামাতার খেদমতের জন্য জিহাদ পরিত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের আবেগ এবং কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের কর্মধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা তাদেরকে বিভ্রান্ত করে।

ফুটনোট

[1] মুহাম্মাদ সুরূর বিন নাইফ, আল-হুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহু, পৃ. ৯-১১।
[2] মুহাম্মাদ সুরুর, আল-হুকমু ১২৩।
[3] মুহাম্মাদ সুরূর, আল-হুকমু, পৃ. ৫৬।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13805

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন